বিশ্বপথিক ভারতরত্ন

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

স্বপন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা। যখন প্রথমবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি তখন নিতান্ত তরুণ। ইংরেজ শাসনের শেষ অধ্যায়ে মৌলানা আজাদ আবার সভাপতি। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সহযোগী হয়ে তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যখন অধিকাংশ মুসলিম নেতা মুসলিম লিগে যোগদান করে পাকিস্তানের দাবি করেছেন তখন মৌলানা আজাদ বিরোধিতা করেছেন। তিনি ইসলামীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং নিজে মুসলমান ধর্মে গভীর বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ—ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে শেষদিন অবধি সোচ্চার। গান্ধিজির একনিষ্ঠ অনুগামী ও পণ্ডিত নেহরুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তথাপি মৌলানা আবুল কালাম গান্ধিজি ও নেহরুর সঙ্গে ভারতবিভাগ প্রশ্নে কখনও একমত নন। মৌলানা নিজের নামের শেষে 'আজাদ' শব্দটি যুক্ত করেছিলেন—তিনি যথার্থই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ।

মৌলানার এতগুণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন তাঁর কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি? দেশের অন্যান্য নেতাদের থেকে তিনি অনেক অর্থেই পৃথক। তাঁর পূর্বপুরুষ মোগলযুগে রাজপুরুষের কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও গভীর ধর্মানুরাগী। মৌলানার মা আরবদেশের নারী। মৌলানার জন্ম মক্কা শহরে। মৌলানার পিতা তাঁর পুত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না-দিয়ে গৃহশিক্ষা দেন। আজাদ কিশোর বয়সে নিজের চেষ্টায় ইংরেজিভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু কোনো দিন ইংরেজি ভাষণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক মানসিকতা ও আভিজাত্য তাঁকে স্বতন্ত্র করেছিল। আজাদ স্বাধীনচেতা মানুষ, কোনো সময়েই জনমতের জোয়ারে স্বমতের বিরুদ্ধে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অন্যান্য বহু মুসলিম নেতাদের ধিক্কার ও কুৎসা সত্ত্বেও আজাদ নিজের মতে অবিচল থেকেছেন। আজাদের একাকিত্বের আরও কারণ আছে।

আজকের দিনে মৌলানা আজাদের জীবন ও কর্ম বিশেষ প্রাসঙ্গিক। আমাদের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা বাস্তবে রূপায়িত করতে মৌলানা আজাদের জীবন থেকে পাঠ নিতে হবে।

শ্রীস্বপন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মৌলানা আজাদের জীবনী, 'বিশ্ব-পথিক ভারতরত্ন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ' বইটি রচনা করেছেন। স্বপনবাবুকে অভিনন্দন এই সার্থক বইটির জন্য। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

২৪ জানুয়ারি ২০১৪
কলকাতা-৭০০০২৫

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি
কলকাতা হাইকোর্ট এবং মুম্বাই হাইকোর্ট

বিষয়সূচি

কথামুখ ৭

ভারত ইতিহাসে নবজ্যোতিষ্কের জন্ম ১৯

মক্কা থেকে ভারতের পথে আবুল কালাম ২৫

মৌলানা আবুল কালামের অধ্যাত্মভাবনা ২৯

বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ও মৌলানা আজাদের ইসলাম এবং ভারতবর্ষ ৪৭

খিলাফৎ আন্দোলন ৫৭

কংগ্রেস সভাপতি ৬৯

কংগ্রেস, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ ৭৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কংগ্রেস, আবুল কালাম ৮৪

ক্রিপস্ মিশন এবং কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা ৯০

ভারত-ছাড়ো আন্দোলন এবং মৌলানা আজাদ ৯৬

পাকিস্তান এবং দেশভাগের দাবি ১০৭

ক্যাবিনেট মিশন, দেশভাগ ১১৮

মৌলানা আজাদের রাজনৈতিক জীবনের ভুল ১২৫

ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে—ইতিহাসের অন্ধকার দিনগুলি ১৩৪

অন্তর্বর্তী সরকার—ভারত ভাগের প্রস্তুতি ১৩৮

মৌলানার স্বপ্নভঙ্গ—জিন্নার কীটদষ্ট পাকিস্তান ১৪৪

স্বাধীন ভারতে বিষণ্ণ ভারতপথিক মৌলানা আজাদ ১৫৪

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ১৬২

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ১৭১

সদ্যোস্বাধীন দেশের শিক্ষানীতি ১৭৮

গ্রামীণ শিক্ষা পরিকল্পনা ১৮৩

শিক্ষার মাধ্যম ১৮৬

দেশের ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ ১৮৭
সদ্যোস্বাধীন ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধান ১৯২
শিল্প, চারুকলা, সংগীত, নাটক, সাহিত্য ২০০
স্ত্রী শিক্ষা ও মৌলানা আজাদের অবদান ২০৫
শিক্ষা ও পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা—কেবল শিক্ষিতরাই স্বাধীন ২০৭
মৌলানা আজাদের উদ্যোগ—আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব ২১০
শিক্ষা শিল্প সংগীত ও সংস্কৃতি ২১৫
দার্শনিক মৌলানার সমাজচিন্তা ও শিক্ষাভাবনা ২১৭
ট্র্যাজিক নায়ক মৌলানা আজাদ ও আমরা ২২২
সহায়ক গ্রন্থ ২৩৬
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনপঞ্জি ২৩৮
নির্দেশিকা ২৪২

কথামুখ

স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিদ্যাবত্তায় বিস্ময় প্রকাশ করে মহাত্মা গান্ধি মন্তব্য করেছিলেন, মৌলানার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা গ্রিক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং পিথাগোরাসের সমকক্ষ। তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান সমুদ্রের মতো। জওহরলাল নেহরু মৌলানা আজাদের জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

> মৌলানা আজাদের বিদ্যার গভীরতা, প্রজ্ঞার বিস্তার এবং অসাধারণ বাগ্মিতার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আরো তো পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ ও বাগ্মি আছেন। মৌলানা আজাদের মধ্যে এঁরা সবাই একত্রিত হয়েছিলেন—অতীত দিনের এবং বর্তমানের। তাঁকে দেখলে আমার মনে পড়ে যায় সেই সব কয়েকশো বছর আগের মহৎ মানুষদের কথা যাঁদের সম্পর্কে ইতিহাসে পড়েছি। তিনি যেন তাঁদের প্রতিনিধি। যদি ইউরোপের ইতিহাসের কথা ভাবি তবে তিনি যেন সেইসব রেনেসাঁ পুরুষদের একজন। যদি তার পরের যুগের কথা ভাবি তবে মনে পড়ে যায় ফরাসি বিপ্লবের আগের সেইসব প্রখ্যাত বিশ্বকোষ আর অভিধান প্রণেতা (encyclopaedist) মহান বিদ্বজ্জনদের কথা। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন সেই প্রাচীন যুগের ঋষিপুরুষদের মহানুবতার দৃষ্টান্ত।
>
> (লোকসভায় জওহরলাল নেহরুর স্মৃতিচারণা)

জওহরলাল নেহরু যাঁদের সঙ্গে মৌলানা আজাদের তুলনা করেছেন তাঁরা হলেন ফরাসি বিপ্লবের সময়ের চিন্তানায়ক দার্শনিক ভলত্যের (ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে,১৬৯৪-১৭৭৮) এবং রুশো জাঁ-জাঁক (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২- ১৭৭৮)। ভলত্যের নিরলস পরিশ্রম করে ফরাসি অভিধান রচনা করেন। মৌলানা আজাদ বারো বছর বয়সে ফারসি অভিধান রচনায় হাত দেন। ভলত্যের যেমন ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক, নেহরুর মতে মৌলানা আজাদের জ্ঞানও ছিল তেমনি দিগন্তপ্রসারী।

খুবই স্বাভাবিক এমন জ্ঞানী মানুষ, এমন মুক্তবুদ্ধি সমাজ-চিন্তক স্বাধীন ভারতের শিক্ষার দায়িত্ব নিন তাইতো চাইবেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কিন্তু রাজি হলেন না মৌলানা আজাদ। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক চরিত্র। আহত, পরাজিত নিঃসঙ্গ। একাই থাকতে চান। নেহরুর কাছে একটি পথ খোলা ছিল—মহাত্মা গান্ধি। তাঁর কোনো কথা কখনও ফেলতে পারেননি মৌলানা। মহাত্মা গান্ধি তাঁর মর্মবেদনা বোঝেন। মৌলানার সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা, তাঁর সত্য-বিশ্বাস, ভারতের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তাঁর চোখের সামনে ভেঙে গেল। মহাত্মা তাঁকে বললেন, কাঁদো, মৌলানা, একলা কাঁদো কিন্তু যে খণ্ডিত ভারত পড়ে রইল তাকে গড়তে শিক্ষার হাতিয়ারটাই যে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। তুমি

ছাড়া এ কঠিন দায়িত্ব কে নেবে? মহাত্মার কথা ফেলতে পারলেন না মৌলানা আজাদ।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে কার হাতে তুলে দিলেন দেশের শিক্ষার ভার আমাদের দেশে হ্যারো-কেম্‌ব্রিজে পড়া প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু! মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জীবনে কখনও কোনো বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে একদিনের জন্যও যাননি। রবীন্দ্রনাথ তবু দু-চারদিন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে গিয়েছিলেন। মৌলানা আজাদের ওপর ভরসাটা কোথায় ছিল তার উত্তর দিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। তিনি বলেছিলেন—'আজাদের কথা বাদ দাও তো! ওর সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়। ও জন্মেছিল পঞ্চাশ বছর বয়স নিয়ে।'

মৌলানা আবুল কালাম জন্মেছেন মক্কায়। শৈশবেই চলে আসেন কলকাতায়। ইসলামধর্ম ও ধর্মদর্শনবেত্তা পিতা পীর খৈরুদ্দিন তাঁর অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিধর পুত্রের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করেন প্রাচীন ইসলামীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে। পনেরো বছর বয়সে 'নিজামি'-র মতো দুরূহ পাঠ্যনির্ঘণ্ট সমাপ্ত করে অধ্যাপনা শুরু করেন। মাত্র বারো বছর বয়সে কাব্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার নাম নইরং-ই-আলম। ওই বয়সেই তাঁর নাম ভারতবর্ষের বাইরে মধ্য-প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একটির পর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় আর মৌলানা আজাদের আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় লেখা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ভারত, ইরান, ইরাক, ইজিপ্ট, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ২৪ বছর বয়সে ১৯১২ সালে প্রকাশিত হল আল-হিলাল পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেন তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> ছোটো বড়ো সব মানুষই জীবনে পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য আলো আর উষ্ণতার উৎসের সন্ধান করে। আমি যখন বালকমাত্র তখন আমিও আমার জীবনের মাটির প্রদীপটি জ্বালাতে চেয়েছিলাম। আমি আমার জীবনপ্রদীপের সল্‌তের প্রথম আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রদীপের আলো থেকে।
>
> আমি তখন ছাত্র। আমি মৌলানার আল-হিলাল পড়তাম। আমি আমার একদল সহাধ্যায়ীদের উঁচু স্বরে আল্‌-হিলাল পড়ে শোনাতাম। আর তখনই আমার জীবনপ্রদীপের সল্‌তেটি জ্বলে উঠল।
>
> [ড. জাকির হোসেনের দিল্লির এক বড়ো জনসভার বক্তব্য]

দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবার দায়িত্ব নিলেন দেশের শিক্ষার আলো-বঞ্চিত সমস্ত ভারতবাসীর জ্ঞানের প্রদীপের আলোটি জ্বালিয়ে দেবার। মৌলানা এপিকটিটাসের মতো বিশ্বাস করতেন, Only the educated are free.

আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতির ভিত গড়ে দিয়েছেন মৌলানা আজাদ। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নসম্পদ, সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন সব কিছুকে বিশ্বের সামনে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণাসংস্থা স্থাপন, আই-আই-টি স্থাপন, ললিত কলা-আকাদেমি স্থাপন, জাতীয় সংগ্রহশালা ও জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন, সাহিত্য আকাদেমি স্থাপন সর্বোপরি সমাজের দুর্বল, দরিদ্র শ্রেণির পরিবারের বালক-বালিকাদের শিক্ষা, বিশেষ করে মহিলা শিক্ষা—সমস্ত বিষয়গুলিকে নতুন ভাবনায় নতুন করে জাতীয় চেতনায় গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, স্বাধীন দেশ গড়তে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির থেকেও বেশি প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি। তিনি যখন শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন (১৫ জানুয়ারি ১৯৪৭ থেকে আমৃত্যু) তখন দেশে শিক্ষার হার শতকরা পনেরো। তিনি বললেন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করতেই হবে। এটাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন। আজ মৌলানার জন্মদিনকে যে ভারতের 'শিক্ষা-দিবসের' (১১ নভেম্বর) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এটা মৌলানা আজাদের প্রতি জাতীয় ঋণ স্বীকার।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। স্বভাবশান্ত, মিতবাক, মৌলানা সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করতেন; এমনকি যে সভার তিনি সভাপতি সেখানেও সভামঞ্চে তিনি সবার পেছনে বসতেন। এরজন্য মহাত্মা গান্ধির কাছে ধমক খেয়েছেন, স্বভাব পাল্টায়নি। তবে যখন বক্তৃতা করতে উঠতেন তখন তাঁর শব্দ চয়নে, বাক্য বিন্যাসে, স্বর ক্ষেপণে এবং বিষয়ের গভীরতায় তিনি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। কেউ তাঁর বাগ্মিতা সম্পর্কে বলেছেন, যেন পদ্ম একটি একটি করে পাপড়ি মেলে পূর্ণ বিকশিত হচ্ছে। কেউ বলেছেন, যেন ভোরের সূর্য অন্ধকার দূর করে পূর্ণ দীপ্তিতে কিরণ মেলে দিচ্ছে।

তিনিই কংগ্রেসের সভাপতিদের মধ্যে সব থেকে কম বয়সে সভাপতি হয়েছিলেন (১৯২৩), আবার দেশ ও সংগঠনের সব থেকে জটিল পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার ঠিক পূর্বের ছয়-বছর অর্থাৎ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি অর্থাৎ সমস্ত সংগঠনের মুখপাত্র। ক্রিপস্ মিশন, ক্যাবিনেট মিশন প্রভৃতি বড়ো বড়ো বৈঠকগুলিতে তিনিই নেতা ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি। মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্ব (যদিও তিনিই প্রথম প্রবক্তা নন) যে সম্পূর্ণ ভুল ও সর্বনাশা তা চিরদিন একভাবে বলে গেছেন। বলেছেন, আমি মুসলমান এবং ভারতবর্ষ আমার দেশ। তেরশো বছরের উত্তরাধিকার আমি ছাড়ব কেন? এ দেশ যেমন হিন্দুর, তেমনি এ দেশ মুসলমানের। এ দেশের সংস্কৃতি, এ দেশের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার ফসল।

১৯৪৭-এর ৪ জুন যখন তাঁর দল দেশভাগ মেনে নিল তখনও তিনি বলেছেন ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। দেশভাগ হলে হিন্দুরও ভালো হবে না, মুসলমানেরও ভালো হবে না।

মৌলানা আজাদ ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। মহাত্মা গান্ধির আততায়ীর হাতে হত্যার পর তিনি অদ্ভুতভাবে বিষণ্ণতায় আর নীরবে দিন কাটাতেন। খুব কম কথা বলতেন। প্রায় কারও সঙ্গেই দেখা করতেন না। নীরবে একা কাজ করে যেতেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ একটু সময়ের জন্য জ্ঞান এলে দেখলেন উৎকণ্ঠিত জওহরের বিষণ্ণ মুখ। প্রিয় বন্ধুকেই জীবনের শেষ কটি কথা বললেন, 'খুদা হাফিজ', 'ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন'। জীবনের এই দীর্ঘ পথে ঈশ্বরের করুণার উপর মৌলানার গভীর আস্থা ছিল।

মৌলানা আজাদ বলতেন কোনো ধর্মের সঙ্গে কোনো ধর্মের মূলগত কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। পয়গম্বর নিজেই তো বলেছেন এই দুনিয়াটাই আমার মসজিদ। এখানে সবাই তো আমার ভাই। তাই মৌলানার, 'বিধর্মী' বলে কোনো শব্দ অর্থহীন বলে মনে হত। শুধু ভারতের নয় সমস্ত বিশ্বের মানুষের শান্তির পথ মৌলানা আজাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায়।

এ বছর মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি। যদিও তিনি জন্মেছিলেন

মক্কায়, কিন্তু তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে কলকাতায়। বাংলায় তিনি বড়ো হয়ে উঠেছেন। একসময় বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন। কোনো মুসলমানের পক্ষে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। ঋষি অরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এই বাংলা থেকেই তাঁর বিশ্বদর্শন। এই বাংলা থেকেই ভারতবর্ষের রাজনীতির শীর্ষ নেতৃত্বের মঞ্চে তাঁর প্রবেশ। যদিও তিনি বিশ্ব-পথিক, ভারতের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক, তবু বাংলার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। বাংলার তরুণ প্রজন্ম মৌলানার অবদানের কথা খুব জানে বলে মনে হয় না। এমন বহুমুখী প্রতিভা, এমন বিদ্বজ্জন, এমন দিগ্‌দর্শী আত্মত্যাগী রাজনীতিজ্ঞ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবেন? এতে মৌলানার কোনো ক্ষতি নেই। আমাদের ক্ষতি। ভারতরত্ন দিয়ে তাঁকে ভুলে গেলে তা জাতীয় ক্ষতি। তাঁর জন্মদিন ভারতের 'শিক্ষা-দিবস'। আমরা ক'জন মনে রাখি?

এসব কথা আমি ভাববার আগে ভেবেছিলেন পুনশ্চ প্রকাশনার কর্ণধার, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়ক। তিনিই আমার মধ্যে ভাবনাটা সঞ্চারিত করেন। আমি অনুপ্রাণিত হই এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মৌলানার জীবনের নানা বিচিত্র দিকের অনুসন্ধান শুরু করি। কিন্তু কাজটি শুরু করে দেখলাম—কাজটি সহজ নয়। আমি আরবি, ফারসি, উর্দু জানি না—তাই কাজটি আমার পক্ষে আরও কঠিন। আমাকে ভরসা দিলেন দঃচব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর মধুসূদন চৌধুরী। তিনি যে পরিশ্রম করে নানা উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা গেল না—বন্ধুতার নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণে রেখে। আমার স্ত্রী শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায় আমার কাজের সর্বক্ষণের সহায় ও উৎসাহদাত্রী। তাঁর প্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া এই কঠিন দায়িত্ব পালন আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

বিশ্বপথিক মৌলানা আজাদের জন্মের ১২৫তম বর্ষে দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনের তথ্যনির্ভর কাহিনি তুলে ধরার প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে ভারত ইতিহাসের এক জটিল সময়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসা ও ইতিহাস পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা।

জানুয়ারি ২০১৪

স্বপন মুখোপাধ্যায়
e-mail : swapan26a@rediffmail.com

ভারত ইতিহাসে নবজ্যোতিষ্কের জন্ম

কলকাতার এক গোপন আস্তানায় ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে কয়েকজন যুবক খুব মন দিয়ে এক বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের আবেগঘন বক্তৃতা শুনছে। সেই দেশপ্রেমিক বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের 'কর্মযোগিন্' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। এই বিপ্লবীর নাম শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বক্তৃতার শেষে তিনি উপস্থিত যুবকবৃন্দের কাছে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আজ এক নতুন সভ্যের পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাদের এই তরুণ বন্ধুটির নাম আবুল কালাম।'

সবার মধ্যেই একটু নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। সবার দৃষ্টি নতুন তরুণ বালক আবুল কালামের প্রতি। মুসলমান! ভাবা যায় না। কোনো মুসলমান যুবক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেবে এটা অবিশ্বাস্য। লর্ড কার্জনের আমলে মুসলমানদের সরকারি কাজে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে বিপ্লবী কাজকর্ম সম্পর্কে গোপন সংবাদ সংগ্রহের কাজে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো যোগ নেই। বরং মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশ প্রকাশ্যে, লিখিতভাবে এমনকি সভাসমিতি করেও লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। সেখানে একজন মুসলমান যুবক সংগঠনের সদস্যভুক্ত হয়েছেন—এটা বিস্ময়ের বটে। তবে সংগঠন যখন কাজে ডেকে নিয়েছে, তখন যথেষ্ট বাজিয়ে, বুঝেশুনেই তাকে সদস্যপদ দিয়েছে।

সভা শেষে শান্ত, নম্র তরুণ, আবুল কালাম বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকে দেশের মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলন থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে কেন? অরবিন্দ ঘোষের লেখার প্রতিটি শব্দ তার খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সে ঠিক করে শ্যামসুন্দরবাবুকে অনুরোধ করবে, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে। তার মনে নানা প্রশ্ন, সেসব প্রশ্নের উত্তর তিনি নিশ্চয় তাকে দিতে পারবেন।

ইসলাম ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম ধর্মগ্রন্থ আবুল কালাম পড়েছেন। এই ধর্মগ্রন্থপাঠে তাঁকে সহায়তা করেছেন কলকাতার বিখ্যাত ইসলামধর্মবেত্তা বিদ্বজ্জনেরা। তাঁর কখনও মনে হয়নি যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। বরং স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হরণ করেছে। ফলে, তার বিরোধিতা দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য। কার্জন যে রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন বাঙালির মধ্যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বীজ বপণ করবার জন্যই বঙ্গভঙ্গ চায়—এ বিষয়ে আবুল কালামের কোনো সংশয় নেই। বিপ্লবী হিন্দু সমিতিগুলি যে মুসলমান বিরোধী—এর জন্য বিপ্লবীদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

পরিচয় হল অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে। বরোদার এই অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন সবার

মুখে মুখে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আবুল কালাম মুগ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন সম্পর্কে অরবিন্দের গভীর জ্ঞান আবুল কালামকে অনুপ্রাণিত করল। সুযোগ পেলেই তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাছে চলে যান এবং তাঁর কথা শোনেন। এদিকে মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মুসলমানদের বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। লেফটন্যান্ট গভর্নর রামফিল্ড ফুলার তো খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন যে, মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের 'প্রিয় বধূ'। তাদের সবরকম সহায়তা করবে ব্রিটিশ সরকার। বিপ্লবী অরবিন্দ .ঘোষ আবুল কালামকে বুঝিয়ে বললেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি সব থেকে ব্রিটিশ বিরোধী। ১৮৫৭-র মহাবিপ্লবের সময় বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পাশে পেয়েছিল ইংরেজ শাসকরা। তখন মুসলমানরা ছিল ব্রিটিশদের সব থেকে বড়ো শত্রু। এখন পাশার দান উল্টে গেছে। ব্রিটিশ সরকার বাঙালি বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের দমন করতে বাঙালি মুসলমানদের তোষামোদ করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়ে দিতে চায়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গর পরিকল্পনারও উদ্দেশ্য তাই।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আবুল কালামের সঙ্গে দলের অনেক বিপ্লবীর পরিচয় করিয়ে দেন। আবুল কালাম বুঝতে পারে বিপ্লবীরা তার সামনে সব কথা আলোচনা করতে অস্বস্তিবোধ করে। বিশেষ করে দলের অভ্যন্তরের গোপন পরিকল্পনার সব সংবাদ তারা আবুল কালামকে দেয় না।

যুবক আবুল কালাম স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানেরও (১৮১৭-১৮৯৮) খুব ভক্ত। সদ্য প্রয়াত আহ্‌মেদ খানের লেখা তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। আলিগড় আন্দোলনের এই শিক্ষাবিদ নেতা ভারতের মুসলমানদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে অশিক্ষা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কূপমন্ডুকতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন স্যার সৈয়দ। তাঁর দুটি লেখা Loyal Muhammadans of India and Cause of Indian Revolt আবুল কালাম মন দিয়ে পড়েছেন। বহু জায়গায় তিনি কিন্তু স্যার সৈয়দের অভিমতের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। অরবিন্দ ঘোষ এবং স্যার সৈয়দের কথার মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি মতের বৈপরীত্যও স্পষ্ট। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, দর্শন এসবের সঙ্গে পরিচিত হতে আবেদন জানান। স্যার সৈয়দের এই উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি আবুল কালামকে আকৃষ্ট করে। স্যার সৈয়দ দেখাবার চেষ্টা করেছেন ইসলামধর্ম খ্রিষ্টধর্মের নিকটতম। আবুল কালাম কোরান এবং বাইবেল খুব মন দিয়ে পড়েছেন। উভয় ধর্ম সম্পর্কে নানা চুল-চেরা বিচার তাঁর নখদর্পণে। তাই স্যার সৈয়দের মূল বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত। অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে প্রাচীন বৈদান্তিক হিন্দুদর্শনকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ী চেতনার উৎস হিসেবে দেখবার যে প্রবণতা আবুল কালাম লক্ষ করেছেন, তাতে অরবিন্দর হিন্দু দর্শনভাবনার সঙ্গে তাঁর ইসলাম ধর্মের কোনো সংঘাত আছে বলে মনে হয়নি। অথচ স্যার সৈয়দ বলছেন, মুসলমানদের ইংরেজদের বন্ধু হওয়া উচিত। ইংরেজদের সবরকমভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের দিতে হবে। ইংরেজদের মন থেকে এই ধারণা উৎপাটিত করতে হবে যে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মনোভাব এখনও

মুসলমানদের বজায় আছে। এই কারণে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খানকে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি সমস্ত মুসলমানদের বলেন কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠনের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ভবিষ্যতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ একটি হিন্দু সংগঠনে পরিণত হবে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের ইংরেজ তোষণ নীতি যেমন মৌলানা আজাদ সঠিক বলে মনে করেন না তেমনি খান সাহেবের হিন্দু বিদ্বেষ এত আক্রমণাত্মক যে মৌলানা আজাদ তার বিরোধিতা না করে পারেন না। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের আহ্বান করে বলেন—

> 'মুহূর্তের জন্য স্মরণ করুন আপনারা কারা? আমরা ছ-সাতশো বছর ধরে ভারত শাসন করেছি। আমাদের হাত থেকেই ব্রিটিশ সরকার এদেশের শাসনভার নিয়েছে। সত্তর বছরেই আমরা আমাদের শৌর্যবীর্যের কথা ভুলে যাব? আমরা মছলিখোর নই, হাত কেটে যাওয়ার ভয়ে কাঁটা চামচ ধরতে ভয় পাই না। যারা একদিন আরব, এশিয়া ও ইউরোপকে কাঁপিয়েছিল, তাদের রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত। আমাদের জাতিই তরবারির জোরে গোটা ভারত জয় করেছিল।' [সরদার বল্লভভাই/ দীপঙ্কর ঘোষ, পৃঃ ২১৭]

এদিকে অরবিন্দ ঘোষ ও যুগান্তর দল সরাসরি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যদিও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কোনো সহিংস আন্দোলনের ঘোর বিরোধী কিন্তু তিনি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য স্থাপনে নিজে পথে নেমে এসেছেন। গান বেঁধেছেন। কলকাতার পথে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আবুল কালাম। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন যে সতীর্থ মুসলমান বন্ধুদেরও বোঝাচ্ছেন যে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের প্রগতিশীল ভাবনা যতই প্রশংসার হোক তাঁর দ্বিজাতি-তত্ত্ব তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না। (স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানই মহম্মদ আলী জিন্নার আগে দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রচার করেন।) আবুল কালাম হিন্দু বিপ্লবী বন্ধুদেরও আস্থা অর্জন করতে সমর্থন হন। তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কেই তোমাদের শত্রু ভাবা ঠিক নয়। কয়েকজন মুসলমান সরকারি অফিসারের আচরণ দিয়ে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু ভাইদের বিরূপ হওয়া উচিত নয়। ইসলাম, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়। আবুল কালাম বিশ্ব রাজনীতি পর্যালোচনা করে দেখান, ইজিপ্ট, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেখানকার মুসলমানরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদি ভারতের মুসলমানদের আস্থা অর্জন করে তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা যায় তবে তারাও জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করবে। শুধু তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। সমাজের একটি বড়ো অংশের আস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে, এমনকি তাদের উদাসীনতাকে মেনে নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়া সহজ হবে না। আবুল কালাম আরও একটি বিষয়ে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল বাংলা-বিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন। সারা দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে

গণ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আবুল কালামের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে বুঝতে পেরে তাঁর উপর নেতৃত্ব উত্তরভারতে ও মুম্বাইতে গোপন বিপ্লবী সংঘ গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়। কাজে হাত দিয়ে উৎসাহ নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরতে থাকেন আবুল কালাম। দেশের নানা স্তরের মানুষের সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হতে থাকে।

১৯০৬, ১৯০৭ এই সব সময়ে তিনি কয়েকটি পত্রিকার হয়ে কাজ শুরু করেন এবং কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনারও দায়িত্ব পান। পত্রিকার কাজের সুবাদে মৌলানা আবুল কালামকে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে হয়। এই অধিবেশনে যোগ দিয়ে আবুল কালাম দেখলেন অধিবেশনের উদ্যোক্তাদের বক্তব্য কেবল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের বিপরীতমুখী নয় তারা সরাসরি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবহারের আশ্বাস দিয়ে ইংরেজদের আস্থাভাজন হতে চান এবং সেই সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিতে আগ্রহী।

তরুণ আবুল কালাম হতাশ হন এবং তাঁর পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। তিনি বুঝতে পারেন কেন বাংলার বিপ্লবী সংগঠন, অনুশীলন সমিতিতে মুসলমানদের কোনো ঠাঁই নেই। আবুল কালাম বুঝতে পারেন মুসলমান-তোষণ নীতির পিছনে ইংরেজ সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে তীব্রতর করে তুলতে পারলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করা সম্ভব হবে। হিন্দু বিপ্লবী সংগঠন তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই একই কারণে মুসলমান সমাজ আন্দোলনের পুরোভাগ থেকে সরে এসে আন্দোলনটারই বিরোধিতা করছে।

আবুল কালাম বিপ্লবী সহিংস আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের আন্দোলন এবং ইংরেজনীতির সমর্থনকারী মুসলিম লীগের ভূমিকা তিনটেই কাছের থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখবার সুযোগ পেলেন এবং তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে না পারলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

সিমলা সাক্ষাৎকারে (Simla Deputation) মুসলিম লীগের সদস্যরা আগা খাঁর নেতৃত্বে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থার (Separate electorate) যে দাবি পেশ করলেন আবুল কালামের আশঙ্কা মতো লর্ড মিন্টো তা লুফে নিলেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এমন সুযোগ আর তিনি হাতছাড়া করবেন কেন? ১৯০৬ সালে যে সিমলা সাক্ষাৎকারের দাবিতে মুসলমানদের জন্য জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্বাচন চাওয়া হল ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো রিফর্মে তার স্বীকৃতি মিলল।

১৯০৮ সালে বিশ বছরের যুবক আবুল কালামের জীবনে একটা সুযোগ এল মধ্য প্রাচ্যের নানা দেশ ভ্রমণের। খুব অল্প বয়স থেকেই আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে দেশ-বিদেশের নানা খবর রাখা ছিল তাঁর নেশা। সেই সঙ্গে প্রাচীন ইসলামীয়

বিজ্ঞান ও দর্শন তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয়, তাই তিনি ১৯০৮-এ ইজিপ্টে গিয়ে অনেকদিন সেখানে ছিলেন। কায়রোর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, আল আজহারে গিয়ে তিনি খানিকটা হতাশ হলেন। তিনি লক্ষ করলেন ভারতবর্ষে যেমন প্রাচীন ইসলামীয় পাঠের মধ্যেই মাদ্রাসাগুলি নিজেদের জ্ঞানচর্চাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে আল আজহারেও তাই। নতুন নতুন জ্ঞানের আলোর প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই, ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শরহিত প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে মধ্যযুগীয় অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আছে। সংস্কারের অভাবে ইসলামীয় দর্শনচর্চার মধ্যে কোনো নতুন আলো পাওয়ার উপায় নেই। আবুল কালাম মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ ঘুরে দেখবার এবং সেখানকার সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ভাবনা সব ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, ইজিপ্ট নানা দেশ ঘুরে তিনি লক্ষ করলেন এইসব দেশে ফরাসি ভাষাচর্চার বেশ আগ্রহ আছে। সেই আগ্রহ আবুল কালামের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। শুধু ফরাসি পাঠ নেওয়া নয় তিনি ফ্রান্সেও গেলেন। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে তিনি বুঝলেন দিন বদলাচ্ছে। মধ্য- প্রাচ্যের মানুষরা আর অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছেন না। তাঁরা ইংরেজি ভাষাচর্চায় আগ্রহী। সেই সঙ্গে তাঁরা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠগ্রহণে আগ্রহী। আবুল কালামও ফ্রান্স ঘুরে যেতে চেয়েছিলেন লন্ডন। কিন্তু বাবার অসুস্থতার খবর শুনে তাঁর আর লন্ডন যাওয়া হল না—কলকাতায় ফিরতে হল। অনেক পরে যদিও তিনি লন্ডন গিয়েছেন।

ইজিপ্টে থাকার সময় আবুল কালামের জীবনে একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশার অনুগামী এক তরুণ তুর্কিদলের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বরাজনীতির পাঠগ্রহণের সুযোগ পান। ইজিপ্টে থাকতে তরুণ তুর্কিদলের সংস্পর্শে আসার সুবাদে যখন তিনি তুরস্কতে গেলেন তখন তুর্কি আন্দোলনকারীদের বহু নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। এই পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হয়।

মুস্তাফা কামাল পাশা ১৯৩৫ সালে আতাতুর্ক অর্থাৎ তুর্কি-প্রধান উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হন এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তুরস্ককে গড়ে তোলেন। কামাল পাশা বয়সে তরুণ। আবুল কালামের থেকে মাত্র আট বছরের বড়ো। ১৯২০ সালে আঙ্কারায় তিনি একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং ১৯২৩-এ তিনি হন তুরস্কর প্রজাতন্ত্রী সরকারের রাষ্ট্রপতি। বেশিদিন বাঁচেননি কামাল। ১৯৩৮-এ মারা যান কিন্তু এত অল্প সময়তেই তিনি গ্রিকদের হারিয়ে এক নতুন আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুললেন। এমন একজন নেতা যে তরুণ বয়সে আবুল কালামকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করবেন, তাই তো স্বাভাবিক। আরেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা হল তাঁর। মুসলমানরা তা হলে ব্রিটিশদের অনুগত ভৃত্য হয়ে থাকতে চায় না, তাদের অনুকম্পাও প্রার্থনা করে না। তারা প্রয়োজনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। আবুল কালাম ভাবতে থাকেন ভারতের মুসলমানরাও তা হলে ইংরেজ বিতারণের জন্য প্রস্তুতি নেবেনা কেন!

দেশে ফিরে আবুল কালাম বুঝলেন স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল করতে হলে আন্দোলনকে